উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব

বুলেটিন ৩ | ২০২৩ মার্চ ১৯ রবিবার

অ্যানিয়েস ভার্দা

কাকে বলি মেয়েদের ছবি?

সে-ছবি কি মেয়ের তৈরি, না কি তার কেন্দ্রে রয়েছে মেয়ে/ মেয়েরা? না কি দুটোই? অথবা, কোনোটাই নয়? বরং অন্য একটা দৃষ্টি, যা পুরুষের চেয়ে আলাদা?

কিন্তু শুধুই কি দৃষ্টি, বা সবসময়েই কি দৃষ্টি? না কি এমন এক ধরনের ছোঁয়া, যা আলাদা করে দেয় বলার ভঙ্গিকে? যেমন ফেমিনিস্ট পুরুষের দৃষ্টি আর ফেমিনিস্ট নারীর দৃষ্টি অনেকাংশে এক হলেও কোথাও একটা মেয়েলিতার তফাত থাকতে পারে।

উলটো দিকে এই প্রশ্নও রাখা উচিত যে, মেয়েদের তৈরি ছবি মানেই কি তা মেয়েদের ছবি? পুরুষের চশমা তো ব্যবহার করেন মেয়েরাও। তা ছাড়া নারী স্রষ্টা মাত্রেই যে তিনি তাঁর নারীসত্তাকে সৃষ্টির মধ্যে অগ্রাধিকার দিতে চাইবেন, তা না-ও হতে পারে।

ফলে মেয়েদের ছবি বলতে মূলত থেকে যায় দুটো বিষয়ই—দৃষ্টিকোণ আর প্রকাশভঙ্গি। এই দুই একসঙ্গে মিলতে পারে, না-ও মিলতে পারে। তা সরাসরি পুরুষতন্ত্রের আদলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, না-ও পারে। তা প্রত্যক্ষ না কি দৃশ্যত উদাসীন, বা উদাসীন বলেই বেশি বিপজ্জনক, সেসবেরও বাইরে আসল কথাটি হল, তা পৃথক। তা অন্য। তার দেখা অন্যরকম, তাই তার স্বরও ভিন্ন।

অন্যথায়, নারীকেন্দ্রিকতাই যদি ‘মেয়েদের ছবি’ হওয়ার শর্ত হত তবে যে ফরাসি ছবিটি শতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছেও অম্লান, কার্ল ড্রেয়ার-এর সেই ‘দ্য প্যাশন অব জোন অব আর্ক’ (১৯২৮; নির্বাক) দিয়েই আলোচনা শুরু করা যেত। তারপর সেই সুতো ধরে হয়তো একটু

এলোমেলো ভাবেই চলে আসত আরও নানা নাম—বার্গম্যান-এর ‘সাইলেন্স’ (১৯৬৩) বা সত্যজিতের ‘মহানগর’ (১৯৬৩)। দে সিকা-র ‘টু উইমেন’ (১৯৬০) বা মেহবুব খানের ‘মাদার ইন্ডিয়া’ (১৯৫৭)। অবধারিত মনে পড়ত ঋত্বিকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবির (১৯৬০) নীতা বা অসিত সেনের ‘উত্তর ফাল্গুনী’ ছবির (১৯৬৩) দেবযানীকে। শ্যাম বেনেগলের ‘ভূমিকা’ (১৯৭৭) আর তার দশ বছর পরে কেতন মেহতার ‘মির্চ মসালা’-র স্মিতা পাটিলকেও কি ভোলা যাবে? আরও একটু এগিয়ে মুজ়ফফর আলির ‘উমরাও জান’ (১৯৮১) ছবির রেখা, কিজ়লস্কি-র ‘থ্রি কালারস: ব্লু’ (১৯৯৩) ছবিতে জুলিয়েট বিনোশে বা সোডারবার্গ-এর ‘এরিন ব্রকোভিচ’ (২০০০) জুলিয়া রবার্টস—অবিস্মরণীয়!

এই স্রোত সতত বহমান। সমাজে মেয়েদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলায় ইরানে নিষিদ্ধ হয়েছিল জাফর পানাহি-র ‘দ্য সার্কেল’ (২০০০), তার ছ-বছর পরে তাঁর ‘অফসাইড’-ও। ২০০৭ সালে ক্রিস্তিয়ান মুনজিউ-এর ‘ফোর মান্থস, থ্রি উইকস অ্যান্ড টু ডেজ়’। ইমতিয়াজ় আলির ‘হাইওয়ে’ (২০১৪)। কোভিডের বাদুড়ছায়া ঘনানোর ঠিক আগে, ২০১৯ সালে পেড্রো কোস্টা-র ‘ভিটালিনা ভ্যারেলা’। অসামান্য সব ছবি, কিন্তু ‘মেয়েদের ছবি’ বলা যাবে কি? তর্ক থাকবে।

তবে বলিউডে অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর ‘পিঙ্ক’ (২০১৬) ছবির কথা এই চর্চায় না টানাই মঙ্গল, কারণ প্রবল ‘ফেমিনিস্ট কন্টেন্ট’ সত্ত্বেও সে-ছবি কার্যত বিগ বি-তে অর্থাৎ বৃহৎ-পুরুষে আচ্ছন্ন। বরং তার উলটো প্রান্তে, অর্থাৎ নারী-নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও সে অর্থে মেয়েদের ছবি না হয়ে জ়োয়া আখতারের ‘লাক বাই চান্স’ (২০০৯) বা ‘জ়িন্দেগি না মিলেগি দুবারা’ (২০১১) অনেক বেশি অভিনিবেশ দাবি করে। দাবি করে নন্দিতা দাশের ‘ফিরাক’ (২০০৯) বা রুচিকা ওবেরয়ের প্রথম ছবি ‘আইল্যান্ড সিটি’ (২০১৫)। নারীকে কেন্দ্রে রেখে গৌরী শিন্ডের মেনস্ট্রিম ‘ইংলিশ ভিংলিশ’ (২০১২) উল্লেখ দাবি করে নিশ্চিত।

সিলিন সিয়ামা

গোড়ার দিকে, মেয়েলি দৃষ্টির সেই উষ্ণতা এবং আঁচ টের পাওয়া গিয়েছিল অপর্ণা সেনের ‘পরমা’ (১৯৮৫) ছবিতে। পরে যে-ধারায় আসবেন দীপা মেহতা (ফায়ার, ১৯৯৬), মেঘনা গুলজার (ফিলহাল, ২০০২ বা রাজ়ি, ২০১৮), কিরণ রাও (ধোবিঘাট, ২০১০), সোনালি বোস (মার্গারিটা উইদ আ স্ট্র, ২০১৫), কঙ্কনা সেনশর্মারা (আ ডেথ ইন দ্য গঞ্জ, ২০১৬)। ভারতীয়-মার্কিনি পরিচালক মীরা নায়ার তাঁর ‘সালাম বোম্বে’ বা ‘মনসুন ওয়েডিং’ নিয়ে তথ্যের খাতিরেই তালিকায় থাকবেন।

যাকে বলছি ‘মেয়েদের ছবি’, বিশ্বে তার প্রথম ধাত্রী যদি কেউ থেকে থাকেন তো তিনি সম্ভবত অ্যানিয়েস ভার্দা। জাতে বেলজিয়ান এই মহিলার গোটা কর্মকাণ্ডই ফ্রান্সে এবং প্রভাবের দিক দিয়ে গোদার-ত্রুফোদের ফরাসি নবতরঙ্গের ‘গুরুমা’ তিনি। মধ্য পঞ্চাশে ছবি বানানো শুরু। প্রথম ছবি সম্পাদনা করেছিলেন অ্যালাঁ রেনে। ১৯৬১ সালে মুক্তি পায় ‘ক্লিয়ো ফ্রম ফাইভ টু সেভেন’, যা আজও চলচ্চিত্র সমালোচকদের বিচারে দুনিয়ার অন্যতম সেরা ছবি বলে বিবেচিত হয়। সে-ছবিতে ক্যামিয়ো রোলে অভিনয় করেছিলেন তরুণ জঁ লুক গোদার আর তাঁর প্রেমিকা আনা কারিনা। সাদা-কালো এই ছবি কিন্তু সমসময়ে তত স্বীকৃতি পায়নি। বরং সেদিক দিয়ে এগিয়ে ছিল ভেনিসে ‘গোল্ডেন লায়ন’ পাওয়া রঙিন ছবি ‘ভ্যাগাবন্ড’।

এর পরেই আসবে আর এক বেলজিয়ান শান্তাল অ্যাকেরম্যান-এর নাম যাঁর ছবি ‘জাঁ দিয়েলম্যান, ২৩, কে দু কমের্স, ১০৮০ ব্রুসেল’ বিশ্বের যেকোনো সেরা ছবির তালিকায় প্রায় চুড়োয় রয়েছে। পরবর্তী ছবি করিয়েদের উপর প্রভাবের বিচারে অ্যানিয়েস-এর চেয়ে কোনো অংশে তিনি পিছিয়ে নেই। তবে তাঁর ছবি দেখতে দর্শকেরও প্রস্তুতি লাগে, মগ্নতা লাগে। দীর্ঘ যাত্রায় ভেরা চিটিলোভা থেকে মার্থা মেসজারোস, লুক্রেসিয়া মার্তেল, ক্লেয়ার ডেভিস বা জেন ক্যাম্পিয়ন থেকে শেরিল দুনি—কত নাম। হলিউডিদের মধ্যে বহু আলোচিত গ্রেটা গারউইগ, ‘গডফাদার’ কপোলা-র মেয়ে সোফিয়া কপোলা বা কৃষ্ণাঙ্গ এভা ডুভারনে।

ফরাসি সিলিন সিয়ামা এই নব্য চলচ্চিত্রকারদের অগ্রণী। হয়তো অ্যানিয়েস-এর যোগ্য ‘নাতনি’ তিনি এবং তাঁরাই। সিলিন-এর সবচেয়ে আলোচিত ছবি ‘গার্লহুড’ (২০১৪) আর ‘পোর্ট্রেট অব আ লেডি অন ফায়ার’ (২০১৯)। তবে তিনি যে জলে আঁচড় কাটতেই এসেছেন, প্রথম কাহিনি ছবি ‘ওয়াটার লিলিজ়’-এ তার ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। একই দেশ ও সংস্কৃতির অ্যানিয়েস থেকে সিলিন পর্যন্ত যাত্রায় সময়ের চলার ছবিটাও উঠে আসে বই কী।

পুরুষেরও কি কখনো নারীর দৃষ্টি বা প্রকাশভঙ্গি থাকতে পারে না? ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘উনিশে এপ্রিল’ হোক বা ‘দহন’, অকালগত জীবনের বেশিরভাগ ছবিই বলবে, পারে। হয়তো সবচেয়ে বেশি দাবি নিয়ে বলবে ‘চিত্রাঙ্গদা’। কিন্তু ঋতুর অন্তর-দৃষ্টি কি পুরুষের? যদি না-হয়, তা কি নিশ্চিতভাবে নারীরও?

সে অন্য প্রসঙ্গ। আপাতত এটুকুই।

সভ্য হোন, ভালো ছবি দেখুন

এ-মাসের ছবি | ১

Vagabond

Sans toit ni loi

[France / 1985 / Col / 105 mins]

Direction: Agnès Varda
Script: Agnès Varda
Starring: Sandrine Bonnaire, Macha Méril, Yolande Moreau
Cinematography: Patrick Blossier
Editing: Patricia Mazuy, Agnès Varda
Music: Joanna Bruzdowicz, Fred Chichin

19 March 2023 @ 5pm

এ-মাসের ছবি | ২

Water Lilies

Naissance des Pieuvres

[France / 2007 / Col / 85 mins]

Direction: Céline Sciamma
Script: Céline Sciamma
Starring: Pauline Acquart, Louise Blachère, Adèle Haenel
Cinematography: Crystel Fournier
Editing: Julien Lacheray
Music: Jean-Baptiste de Laubier

19 March 2023 @ 7.15pm

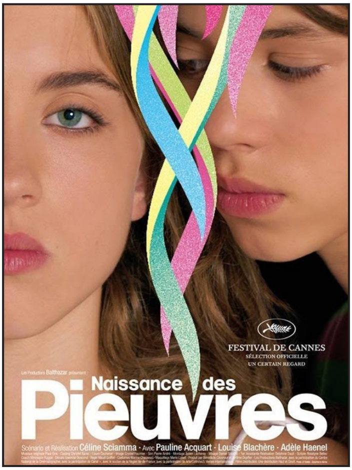

ছবির আড্ডা

ছবি দেখানোর দিন তো থাকছেই *cine adda@break*! কিংবা যেকোনো রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ক্লাবঘরে সিনে-আড্ডা দেওয়া যাবে।

আবহমান সূর্যমুখী

শ্রমণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবির শুরু আসমুদ্র বিস্তৃত সূর্যমুখীর খেতের উপর দিয়ে পর্দায় নাম ফুটে উঠতে থাকায়। তার হলুদ বাতাসে প্রেম-প্রেম ভাব।

ভিত্তোরিয়ো দে সিকা-র 'সানফ্লাওয়ার' ছবির ঘটনা চলতে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইতালির এক সরকারি অফিস থেকে। নানা ঘটন-অঘটনের পর সূর্যমুখীর দেখা ফের আমরা পাই ছবির অর্ধেক কেটে যাওয়ার পর। জিয়োভান্না (সোফিয়া লোরেন) তখন খুঁজে চলেছে যুদ্ধে গিয়ে নিখোঁজ স্বামী আন্তোনিয়ো-কে (মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ানি)। মরিয়া হয়ে ইতালি থেকে সে চলে যায় ইউএসএসআর-এ। সেখানে এক সোভিয়েত আমলার সঙ্গে পৌঁছোয় শুরুর সেই সূর্যমুখী খেতের ধারে এবং আমরা জেনে শিউরে উঠি যে তার নীচে আসলে পোঁতা রয়েছে গণকবর। অক্ষশক্তির হয়ে রাশিয়া আক্রমণ করতে আসা হাজার হাজার ইতালীয় ও অন্যান্য যুদ্ধবন্দির দেহ সেই হাজার হাজার সূর্যমুখী গাছের সার হয়ে মাটিতে মিশেছে।

ছবির শেষ পর্যন্ত দেখলে পুরো ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়। পরিচালক সূর্যমুখীকে ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে দেখাতে চাননি, চেয়েছেন অসম্পূর্ণ গল্পের স্মারক হিসেবে দেখাতে। জিয়োভান্না আর আন্তোনিয়ো-র গল্প যেমন শেষ পায় না, তেমনই অনেক অনেক অসমাপ্ত গল্প ওই সূর্যমুখীর খেতের মাটিতে মিশে রয়েছে।

কিন্তু, এখনও কেন সূর্যমুখী? উত্তর হয়তো—স্লাভিক সংস্কৃতি।

পিটার দ্য গ্রেট-এর হাত ধরে এই ফুল আসে পূর্ব ইউরোপে এবং অনায়াসেই জনপ্রিয়তা লাভ করে বীজ আর তেলের দৌলতে। গোড়ায় চাষাভুষোদের জিনিস বলে ব্যঙ্গ করা হলেও আস্তে আস্তে সমস্ত স্তরেই সূর্যমুখীর বীজ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হালে ভ্লাদিমির পুতিন এবং দ্মিত্রি মেদভেদেভকেও বহুসময় সেই বীজ চিবোতে দেখা গিয়েছে। ভ্লাদিমির নবোকভ একবার বলেছিলেন, শুধু সূর্যমুখীর বীজ আর ভদকা ছাড়তে পারলেই গোটা ইউএসএসআর স্বর্গে পরিণত হত!

ইউএসএসআর ভাঙার পর স্বাধীন ইউক্রেনের জাতীয় ফুল হয়েছে সেই সূর্যমুখীই। হালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময়েও দেখা গিয়েছে ইউক্রেনীয় বাবুশকা-রা (দিদিমা-ঠাকুমারা) হানাদার রুশ সৈনিকদের পকেটে ঢেলে দিচ্ছেন সূর্যমুখীর বীজ। যার অর্থ—আপাতত জিতলেও হার এবং মৃত্যু তাদের বাঁধা এবং তখন যেন তাদের দেহও সূর্যমুখীর সারের কাজে লাগে। সন্দেহ হয়, আদৌ কি এই ছবি প্রেমের? আন্তোনিয়োকেও কি যথার্থ প্রেমিক বলা যায়? জিয়োভান্না যখন স্বামীকে খুঁজতে গিয়ে রাশিয়ায় তার নতুন সংসারের খোঁজ পায়, তারপর থেকেই ছবি যেন এক বৃহত্তর প্রশ্নে উত্তীর্ণ হয়। ভালবাসা আর না-ভালবাসা ঘর বদল করতে থাকে।

না এটা মাস্ত্রোইয়ানি বা লোরেন-এর সেরা কাজ, না দে সিকা-র। ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রদের ত্রুটিপূর্ণ গল্প কিছু প্রশ্ন তুলে রেখে চলে যায়।

Sunflower, Vittorio De Sica, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ক্লাবে দেখানো হয়

ছবি নিয়ে কথা | ২

মুড ফর লাভ: ডোয়েলের সরু চোখ

পলাশ দাশগুপ্ত

ওয়ং কার-ওয়েই-এর সঙ্গে চিত্রগ্রাহক ক্রিস্টোফার ডোয়েল-এর গাঁটছড়া অনেকটা সময়ের। ১৯৯১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত। শোনা যায়, এক ধরনের একঘেয়েমির কারণে ক্রিস্টোফার ডোয়েল জুটি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। বোঝা যায়, ওয়ং কার-ওয়েই দীর্ঘ সময় ধরে বিশেষ ধরনের ন্যারেটিভ ও ভিশুয়াল স্টাইলে কাজ করে গিয়েছেন।

কী সেই স্টাইল? সেটা বুঝে নিতে সদ্য দেখা 'ইন দ্য মুড ফর লাভ' ছবিটার কথাই ধরা যাক।

ভীষণ আঁটোসাঁটো ফ্রেমে, এতটুকু অতিরিক্ত জায়গা (স্পেস) না রেখে তাঁর চরিত্রদের নড়াচড়া, চলাফেরা করান ওয়েই। অতিরিক্ত কোনো চরিত্রও (একস্ট্রা) রাখেন না। ফলে সিনেমাটোগ্রাফারের দু-টি মূল উপকরণ, লেন্স ও আলোর ব্যবহারে ডোয়েলও একটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। একই অবস্থানে ক্যামেরা রেখে শুট করে যান একাধিক সিকোয়েন্স-স্পেসের

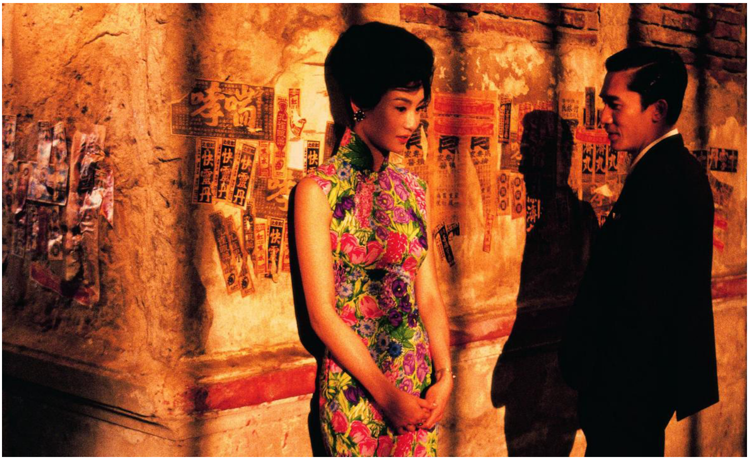

পুনরাবৃত্তির বোধ আনার জন্য। দর্শককে আড়ি পেতে দেখার স্বাদ দিতে প্রায় পুরো ছবি জুড়েই থাকে ‘ফ্রেম উইদইন ফ্রেম’—নানা ছকে।

গল্পের ষাটের দশকের হংকং, ছবি তৈরির সময়ে, অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকের শেষে এসে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। ফলে সিনেমায় সংকীর্ণ পরিসরের ব্যবহার শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে যেমন দরকার হয়ে পড়ে, একই কারণে ক্লোজ় আপ বা মিড শটেরও ব্যাপক ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে ছবির চলন কোথাও ভারসাম্য হারায় না—এখানেই ডোয়েল অনন্য।

রঙের ব্যবহারে ডোয়েল যতটা না অনেকের মতো পাশ্চাত্য ধ্রুপদি চিত্রশৈলীতে আস্থা রাখেন, তার চেয়ে বেশি রাখেন গল্পের লোকেশন পর্যবেক্ষণে। তাঁর রং আসে পারিপার্শ্বিক থেকে। যেমন ধরা যাক, এশিয়ান মেয়েরা খানিক তামাটে হলেও নিজেদের ফর্সা দেখতে পছন্দ করেন। ডোয়েল তাই অভিনেত্রীদের ত্বকে একটা অতিরিক্ত সাদাটে ভাব নিয়ে আসেন।

ডোয়েল মনে করেন, দৃশ্যে চরিত্রদের চলাফেরা আর ক্যামেরার চলাফেরা একটা অদৃশ্য নাচের ছন্দে বাঁধা। মনে করা যাক অন্ধকার সংকীর্ণ গলি দিয়ে সু (ম্যাগি চিউং) আর চাও-এর (টোনি লিউং) হেঁটে আসার ট্রলি শট। সামনের জমিতে (ফোরগ্রাউন্ড) গরাদের শিকের মতো পেরিয়ে যাওয়া একের পর এক ছায়া। লোকেশনের স্থাপত্য আর আলোই ডোয়েলকে সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণা দেয়।

অল্পবয়সে নিজের দেশ অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে বেরিয়ে, নানা দেশ নানা পেশা ছুঁয়ে থিয়েটার, ফোটোগ্রাফি হয়ে অবশেষে চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় থিতু হয়েছেন ডোয়েল। তিনি মনে করেন, শিল্পসৃষ্টির চেষ্টা বৃথা, বরং নিরন্তর শিল্পী হয়ে থাকার চেষ্টা থেকেই আসল শিল্পের জন্ম হয়। সিনেমার প্রচলিত নিয়মের চেয়ে নিজের ব্যাখ্যাতীত অনুভূতির উপর বেশি জোর দেওয়া এই মানুষটি সমসাময়িক সিনেমাটোগ্রাফির অন্যতম খুঁটি।

In The Mood For Love, Wong Kar-wai, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ক্লাবে দেখানো হয়

First Day at Uttarpara Cine Club

Ankita Pal

Feeling a tad unnerved and out of place at 5 PM in front of Netaji Bhavan, still considering whether or not to enter, I stepped in. What I didn't expect was that this decision would forever change a big part of me.

Never knew these kinds of experiences are such an intrinsic part of our existence. A fraction of my nervousness arose from the fact that I only had one familiar face within this sea of unfamiliar visages. But this notion changed soon after.

During the ending of the first movie 'Sunflower', watching the receding train when Antonio leaves Giovanna for the very last time, I noticed someone wiping her tears just as I was hiding mine. Realization struck hard, I instantly knew that in this anonymous crowd, emotion binds us all and language could never be considered a boundary.

In the world of 30 seconds of instagram reels and having an attention span of a bee, it is an exceptional opportunity for us millennials to slow down once in a while. If I could explain this experience in a short phrase, I would say it was 'more than subtitles'. Some dynamics change when you're watching a movie with people of variable ages who pitch in with their knowledge and perspective, it becomes a clairvoyant experience.

In the month of love, we were brilliantly introduced to the intricacies and depth of this emotion by the movies *Sunflower* and *In the Mood for Love*, which although showcased contrasting aspects of love bound by war, released in different timelines nonetheless imparted the same message.

I would love to put a note of thanks for inviting me to be a part of this legacy and for all the warmth, for I did not feel like an imposter on my first day.

অযান্ত্রিক
আন্দ্রেই তারকোভস্কি-র জীবন ও চলচ্চিত্র নিয়ে উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবের মুখপত্র 'অযান্ত্রিক'-এর ষষ্ঠ সংখ্যার কিছু কপি এখনও মিলছে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবের পক্ষে অমিয়রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬বি, রামনিধি চ্যাটার্জি লেন, উত্তরপাড়া, হুগলি থেকে প্রকাশিত ● uttarparacineclub@yahoo.co.in | 94330 41918 | 94332 71785 | 98755 98829